IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বনফুলের নির্বাচিত একাঙ্ক নাটক: সমাজবাস্তবতার বহুমাত্রিক রূপ

(Banaphul's Selected One-Act Plays: Multidimensional Facets of Social Reality)

রাধা গোবিন্দ নসিপুরী,
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত

Abstract: Banaphul is a renowned figure in the landscape of 20th-century Bengali literature. Although he is primarily recognized for his contributions to fiction, he was equally a successful artist in the realm of dramatic literature. 'Dashabhan' (1944) is a collection comprising ten of his one-act plays. From this anthology, we have selected three plays—'ShikKabab', 'Lehya', and 'Jal'—for the purpose of this analysis. In the play 'ShikKabab', the playwright vividly portrays the inner anguish of women within the patriarchal social structure of that era. Through the character of Soudamini, the dramatist depicts the attitude of certain hedonistic men toward the women of that time. Employing the metaphor of the dish Shik Kabab, he successfully encapsulates—within the concise scope of a one-act play—the moral degradation of men who lust after the female body like predatory beasts. The characters—the Zamindar, his sycophant Pannalal, and Jibandhan—serve as representatives of that very society. In the second play, 'Lehya', he presents a tableau of a social reality where young people are not required to demonstrate their competence to secure employment; rather, mere sycophancy toward leaders occupying high positions is sufficient to achieve success. Job seekers manage to obtain appointments—specifically for the post of Private Secretary—by merely "licking the boots" of those in power, without offering any proof of their actual qualifications. Here, Banaphul highlights the plight of educated Bengali youths—both male and female—residing outside Bengal, specifically in the region of Bihar. In the third play, 'Jol', he depicts the communal conflicts prevalent in colonial India in a novel and unique style. Through a scientific lens, he portrays this dialectical backdrop using the metaphor of hydrogen and oxygen atoms. This conflict, in essence, serves as a microcosm of the discord between the Hindu and Muslim communities. At the conclusion of the play, the dramatist envisions a union between the two communities—a reconciliation akin to the scientific process wherein hydrogen and oxygen atoms combine to form the new compound: water. This research paper will explore how the multifaceted nature of contemporary social reality is reflected in these plays.

Index Terms: One-act play, social realism, 'Shikkabab', women's inner anguish, 'Lehya', unemployment problem, 'Jol', communal conflict.

ভূমিকা: বাংলা সাহিত্যের ধারায় একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের নাম বনফুল। তাঁর আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হলেও পাঠকমহলে তিনি বনফুল ছদ্মনামেই বেশি পরিচিত। কেবল ছোটগল্প এবং উপন্যাসই রচনা করেননি। নাটক রচনাতেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'মালঞ্চ' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের পর তাঁর কবিত্বের বিকাশ ঘটে। ডাক্তারি অধ্যয়ন করতে কলকাতায় আসার পর 'প্রবাসী', 'ভারতী'র মতো বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকাগুলোতে তাঁর কবিতা ও ছোটগল্প প্রকাশ হতে থাকে। সাহিত্যের মধ্যে তিনি এক নতুন রসের আমদানি করলেন—ডাক্তারি রস। ডাক্তারি পাস করার পর তিনি মানুষের মনের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তাই বিজ্ঞানসম্মতভাবে সবকিছুকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। তাঁর 'দশভাণ' একটি অন্যতম একাঙ্ক নাটকের সংকলন। এতে মোট দশটি নাটক আছে, নাটকগুলি হল—'শিককাবাব', 'লেহ্য', 'জল', 'অবাস্তব', 'নব সংস্করণ', 'বানপ্রস্থ', 'কবয়ঃ', 'আকাশ নীল' 'অন্তরীক্ষে', ও

'১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮'। আমরা আলোচনার জন্য তাঁর 'দশভাণ' একাঙ্ক নাটক সংকলন থেকে 'শিককাবাব', 'লেহ্য' ও 'জল' এই তিনটি নাটক নির্বাচন করেছি।

নাটক একটি বৃহৎ শিল্পকর্ম। সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নাটকের জন্ম হয়েছিল। আচার্য ভরত নাটককে বলতেন 'রূপক' এবং তিনি দশ রকম 'রূপক'-এর কথা বলেছেন। যার মধ্যে পাঁচটি ছিল একাঙ্কের বিভিন্ন রূপ—ব্যায়োগ, প্রহসন, ভাণ, বীথি ও অঙ্ক। 'ভাণ' ছিল শৃঙ্গার রসের নাটক। প্রাচীন ভারতীয় এই 'ভাণ' নামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যিক পরশুরাম বনফুলের একাঙ্ক সংকলনের নামকরণ করেছিলেন 'দশভাণ'। বনফুল কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রীতিতে এই ভাণগুলো রচনা করেননি। এক অঙ্কের এই নাটকগুলিতে তিনি মূলত সমাজের নানান সমস্যার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কটাক্ষের তির্যক ভঙ্গিতে। তিনি নিজে বলেছিলেন, এর পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে মাঝে মাঝে একাঙ্ক নাটক লিখতেন। পরে সেগুলি 'দশভাণ' (১৯৪৪) নামে প্রকাশিত হয়। নাটকগুলির নামকরণ করেন রাজশেখর বসু। একাঙ্ক নাটক হল এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। নানান সমালোচক এই সংরূপটির নানান সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুত, যা এক অঙ্কের পরিসরে, স্বল্প চরিত্র ও স্বল্পায়তনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত মুহূর্তের ভাবসূত্রে গঠিত হয় এবং যা তীব্র আবেগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর পরিবেশে বিদ্যুৎ গতিতে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করে পরিণতির দিকে পৌঁছায়, তাকে একাঙ্ক নাটক বলে। নাট্যকার দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন:

> "একাঙ্কিকায় জীবনেরই রূপ প্রতিবিম্বিত হয়; কিন্তু অল্প আয়তনে জীবনের সামগ্রিক রূপ উপস্থাপিত করা যায় না। তাই এতে জীবনের খণ্ডরূপের মধ্য দিয়ে পূর্ণরূপের ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। জীবনের বিশেষ একটি গূঢ়-গভীর দিককে তুলে ধরে তারই সাহায্যে সমগ্রতার আভাস দেওয়াই এর কাজ।"[১]

বাংলা সাহিত্যে মন্মথ রায় শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ লেখক।[২] 'একাঙ্কিকা' নামটিও তিনি দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক। এরপর সমকালে ও উত্তরকালে অনেকেই একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন—শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বনফুলও একাঙ্ক নাটক রচনা করে এই ধারায় স্থান করে নিয়েছেন।

'শিককাবাব' নাটকে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অন্তর্বেদনার রূপচিত্রটি অঙ্কন করলেন নাট্যকার বনফুল। নাটকের সৌদামিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সে যুগের নারীর ওপর কয়েকজন ভোগবিলাসী পুরুষের মনোভাব চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। শিক কাবাব নামক খাবারের রূপক ব্যবহার করে নারীদেহের মাংস লোলুপ নরপশুদের চারিত্রিক অধঃপতন এক অঙ্কের স্বল্পায়তনে সফলভাবে তুলে ধরলেন। জমিদার, মোসাহেব পান্নালাল ও জীবনধন চরিত্র সেই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। দ্বিতীয় নাটক 'লেহ্য'-তে রূপ দিলেন সেই সমাজবাস্তবতার করুণ প্রতিকৃতি, যেখানে চাকরি পেতে হলে যুবক সমাজকে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় না। উচ্চতর পদে আসীন নেতাদের নিকট চাটুকারীতা দেখালেই কিস্তিমাত। হরেন নামক এক চাকরিপ্রার্থী প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ লেহন করে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যায় কোনরকম যোগ্যতার প্রমাণ ছাড়া। এখানে বনফুল বাংলার বাইরে বিহারে বাঙালি শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের দুরবস্থাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তৃতীয় নাটক 'জল'-এ পরাধীন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের রূপচিত্র বর্ণনা করেছেন এক অভিনব স্টাইলে—বিজ্ঞানী মেজাজে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পরমাণুর রূপক-এ দ্বান্দ্বিক পটচিত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব আসলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই প্রতিরূপ। নাটকের শেষে নাট্যকার উভয় জাতির মধ্যে কাল্পনিক সম্মিলনের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে গঠিত নতুন যৌগ জল-এর মতোই মিলন দেখানো হয়েছে। এই তিনটি নাটক অবলম্বনে আমরা সমাজবাস্তবতার বহুমাত্রিক রূপটি আলোচনা করবো।

মূল আলোচনা:

'শিককাবাব': পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও নারীর অন্তর্বেদনার প্রতিচ্ছবি

'শিককাবাব' নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'-তে আষাঢ় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। এই নাটকের চরিত্রবৃন্দের মধ্যে আছে সাতজন— অপ্রধান চরিত্রে করিম, শিবু, ভুট্টা, এবং প্রধান চরিত্রে পান্নালাল, জমিদার ও জীবনধন, আর পরোক্ষ চরিত্র সৌদামিনী। শিক কাবাব একটি খাবারের নাম। লোহার শিকে অনেকগুলো মাংসের টুকরো বিদ্ধ করে আগুনে ঝলসে ঝলসে যে খাবার তৈরি করা হয় তাকে শিক কাবাব

বলে। বনফুল রূপকের আশ্রয় নিয়ে এই নামের আড়ালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অন্তর্বেদনার চিত্রটি প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনি নাটকের স্থানগত, কালগত ও ঘটনাগত ঐক্য বজায় রাখার জন্য নাট্যকাহিনিতে এক অন্য পরিবেশের মাত্রা যোগ করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি প্রকাণ্ড হলঘরের ছবি। বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, একটা বড় বরগা ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চলে গিয়েছে। পর্দা টাঙিয়ে হলটিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঘরের দুইদিকে দুটি দরজা। ঘরের মাঝামাঝি একটা গোল টেবিল এবং দেওয়াল ঘেঁষে ছোট আর একটা টেবিল ইত্যাদি। নাটকের প্রয়োজনেই মঞ্চোপযোগী একটা স্থান নির্বাচন করে নিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অন্তর্বেদনার কথা বলতে গিয়ে তিনি এক নতুন স্টাইলে নাট্যকাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে পুরুষকৃত অত্যাচারের কাহিনি এক পুরুষের সংলাপেই ব্যক্ত করা হচ্ছে। আসলে এর মাধ্যমে বনফুল সেই সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন। আর যাকে কেন্দ্র করে নাটকের মূল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু সেই সৌদামিনী চরিত্রটির একটি সংলাপও কিন্তু তিনি নাটকে ব্যবহার করেননি। নাটক সাধারণত কুশীলবদের সংলাপের মধ্য দিয়েই পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। গল্পের অবকাশ সেখানে কম। নাট্যকার বনফুল সীমিত পরিসরে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ঘটনার মোড়কে নিয়ে গেছেন পান্নালালের সংলাপকে মাধ্যম করে।

কাহিনির শুরুতেই নাট্যকার বনফুল সৌদামিনীর কোন প্রসঙ্গ আনেননি। জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায় বন্ধু এবং মোসাহেবদের আড্ডার এক পরিবেশের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। আড্ডা শুরুর আগে বাবুদের আড্ডাকে জমজমাট করার জন্য চাকরদের তোরজোড় শুরু হয়ে গেছে। শিককাবাব তৈরির জন্য চাকর করিমের তলব—"কই রে, শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়"[৩] সংলাপ দিয়ে নাটক শুরু হচ্ছে। করিম সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে ঘরের মাঝামাঝি পর্দা টাঙানোর কথা বললে, শিবু তাকে ইশারায় চুপ করতে বলেছে।

> "শিবু। আরে, চুপ চুপ করিম মিয়া অত চেঁচায় না।...
> করিম। দেখছি তো, পর্দা টাঙালে যে হঠাৎ?
> শিবু। (চুপি চুপি) ওপারে মেয়েমানুষ আছে।"[৪]

ওপারে মেয়েমানুষ আছে তাই পর্দা টাঙানো হয়েছে। করিম ও শিবুর কথোপকথনে নাট্যকার কাহিনিকে ঘনপিনদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাদের সংলাপে ছোট্ট অবসরে জমিদার গোষ্ঠী এবং মেয়েটির সম্পর্কে একটা সাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে পাঠকের পরবর্তী ঘটনাক্রম জানার কৌতূহল জন্ম হয়। এই কথোপকথনে জানা যায় জমিদারের নতুন মোসাহেব আজ সন্ধ্যায় কোথা থেকে একটি মেয়ে জুটিয়ে এনেছেন, জমিদারের মনোরঞ্জন করবার জন্য। শিবু বলেছে, "তাই না শিক-কাবাব করবার জন্যে তোমার ডাক পড়েছে। তোমার হাতের শিক-কাবাব নইলে কর্তার ফুর্তিই জমে না যে।"[৫] সকালে টেলিগ্রাফে খবর আসার পর মেয়েটিকে আনতে জমিদারবাবু বেয়ারাদের পালকি নিয়ে স্টেশনে পাঠিয়েছেন। মেয়েটিকে রাখার জন্যই হলঘরের মাঝে পর্দা টাঙানো হয়েছে। এই মেয়েটিকে কিন্তু আশ্রয় দেওয়ার জন্য আনা হয়নি, তাকে এত ঘটা করে আনা হয়েছে শিক কাবাবের মতোই ভোগ করার জন্য। করিম যখন বলেছে, "বাগ্‌দীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক, শেষ পর্যন্ত তো আমাদের ভোগেই লাগবে।" উচ্ছিষ্টভোগী কুকুরের মতো চাকররাও ওঁতপেতে থাকে। যেমন মুনিব তার তেমন চাকর। সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় মোসাহেব পরিবৃত জমিদার বংশের পুরুষদের এমন ঘটনাই অনবরত ঘটত।

জমিদার ও পান্নালালের কথোপকথন থেকে সৌদামিনীর জীবনের অন্তর্বেদনার ছবিটি স্পষ্টরূপে উঠে এসেছে। নাট্যকার নাট্যরস জমিয়ে তোলার জন্য মেয়েটির জীবনের ঘটনাক্রমকে প্রথাগত রীতি ভেঙে শুরু থেকে নয় বরং এলোমেলো করে বর্ণনা করেছেন। মেয়েটির বর্তমান অবস্থান জমিদারের বৈঠকখানার পর্দার আড়ালে—এটা কাহিনির শুরু। জমিদার পান্নালালের কাছে মেয়েটির জীবনের ইতিহাস সবিস্তারে জানতে চেয়ে বলেছেন:

> "ইতিহাসটি পুরোপুরি না শুনে আমি ছুঁচ্ছি না ওসব। সেবারে মনে নেই, এক পুলিস-কেসেই ফেঁসে গেলাম বাবা, হাজারখানেক টাকা লম্বা হয়ে গেল ঘুষঘাষ দিতেই। এসো, বসা যাক, ভাল করে সব গুছিয়ে বল দিকি শুনি।"[৬]

সৌদামিনী এক দরিদ্র ঘরের মেয়ে। মেয়েটির বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তার বিয়ের জন্য পাত্র পাওয়া যায়নি। বাবা-মা মেয়ের বিয়ের জন্য ছটফট করে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু পাত্রপক্ষের কেউ চাইল টাকা, কেউ চাইল রূপ, আবার কেউ চাইল গান-বাজনা-নাচ; কেউ চাইল লেখাপড়া, আবার কেউ চাইল সবকিছুই। বরপক্ষের চাহিদা ছিল সবই প্লাসের কোঠায়, আর মেয়েপক্ষের বেলায় সবই মাইনাস। তাই বিয়ে হ'ল না, বয়স বাড়তে লাগল। এ থেকে বোঝায় যাচ্ছে যে, আর পাঁচটা মেয়ের মতো বিয়ে করে সংসার করার সুখ সৌদামিনীর জীবনের শুরুতেই বিনষ্ট হয়ে গেল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে সে এক যুবকের প্রেমে পড়ল। কিন্তু একে অপরের মনে মিললেও তাদের জাতে মিলল না। তাই তারা দু'জনে বাড়ি থেকে কাশী পালিয়ে গেল। কিন্তু সেখানেও শান্তি পেল না সে। কাশীর পাণ্ডারা তাকে বন্দী করে রাখল। যুবকটি টাকা এবং গায়ের জোরে না পেরে সৌদামিনীকে ফেলে চলে গেল। এরপর সে দশদিন মতো সেখানে থেকে অসহ্য হয়ে একা একা রাতের বেলা পালিয়ে গেল। সেখান থেকে পালিয়ে সন্তোষবাবু বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়ে চাকরানীর কাজে বহাল হল। এখানে সে আবার ভদ্রলোকের এক ভাগ্নের সঙ্গে প্রেমে পড়ল। ছেলেটি বিয়ে করবার জন্য তাকে নিয়ে কলকাতায় এল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েটির বিয়ে হল না। ভদ্রলোক গিয়ে সে বিয়েতে বাধা দিলেন। এরপর তার ঠাঁই হল এক 'অবলা আশ্রমে'। ওই আশ্রমের ম্যানেজার মেয়েটির প্রতি কু'নজর দিল। রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করার ভয় দেখাল। রাজি না হলে পাঞ্জাবি ড্রাইভারের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার কথাও বলল। অতঃপর সৌদামিনী প্রাণ বাঁচাতে আবার পালিয়ে গেল। অবশেষে শিয়ালদা রেলস্টেশনে এসে পৌঁছল সে। এখানেই মেয়েটি পান্নালালের খপ্পরে পড়ে। সৌদামিনী তার জীবনের অন্তর্বেদনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে যায়। পুলিশ এসে পড়ায় তার এ কাজ করা হয়না। পান্নালাল পুলিশকে ঘুষ দিয়ে জমিদারের বাড়িতে চাকরি দেবে এই আশ্বাস দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে আসে।

সৌদামিনীর জীবন পরিক্রমায় আমরা বারবার এক নারীর সামাজিক অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি দেখলাম। যে নিজের পরিবারে অবিবাহিত থাকার সময় থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত বারবার অত্যাচারিত হয়েছে। আত্মহত্যা করে যন্ত্রণার দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আবার একটু শান্তির আশ্রয় পাওয়ার জন্যই হয়তো এক অপদার্থ পুরুষের ফাঁদে পা দিল। সে জানে না যে, কোন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে চলেছে। তার শরীরের রক্ত-মাংস নৈবেদ্য হয়ে নীচ প্রবৃত্তির পুরুষের টেবিলে শোভা বর্ধনের জন্য তাকে আনয়ন করা হয়েছে তা সে জানত না। যখন পর্দার আড়াল থেকে জমিদার-বন্ধুদের কথোপকথন থেকে বুঝেছে, অতীতের একদল শ্বাপদের মতো এদের মুখের শিকার হতে চলেছে তখন সে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে।

শিক কাবাব এই খাদ্যবস্তুটি নাটকের নামকরণে এক বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। শিবু এবং করিমের চেষ্টায় শিকের মধ্যে মাংস গেঁথে গেঁথে অনেক অপেক্ষা করে তৈরি হয়েছে শিক কাবাব। আর অপরদিকে জমিদার ও বন্ধুদের অপেক্ষা শুধু শিক কাবাব নয়, শিক কাবাবের রূপক সেই মেয়েটির শরীরের জন্য। যে জীবনধন মেয়েমানুষের নাম শুনলেই অপেক্ষা করে থাকতে পারে না, তার আসতে অনেক বিলম্ব হচ্ছে বলে জমিদার অপেক্ষা করে আছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে নাকি এখন দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল। জীবনধন এসে এসেই মেয়েটিকে দেখার জন্য আর তর সইতে পারছিল না। করিম এমন সময় শিককাবাবের একটা শিক দিয়ে গেল। কাবাবের মাংস কাঁচা থাকায় পান্নালাল ও জমিদার প্লেট রেখে দিলেও জীবনধন কিন্তু সে মাংসই শ্বাপদ জন্তুর মতো চিবিয়ে খেতে থাকে।

> "জমিদার। আরে, ছি ছি জীবনধন, তুমি করছ কী, কাঁচা মাংসগুলো চিবুচ্ছ? রক্ত বেরুচ্ছে যে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে।
> জীবনধন। বড় মিঠে লাগছে কিন্তু।"[৭]

জীবনধনের এমন বীভৎস দৃশ্য রচনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার এটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, যে তার মেয়েটিকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহ আসলে পুরুষের নারীর শরিরের প্রতি ইন্দ্রীয়ের অসংযত কামনার রূপ। শিককাবাবের শিকে আবদ্ধ মাংসের টুকরো আর পুরুষের অসংযত কামনার শিকে কাবাবের মতো আবদ্ধ হয়ে আছে কত নারীর শরীর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু'র কথা মনে পড়ে, যে পাঁচি'র প্রতি আদিম জৈবক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিল। আর বনফুলের 'শিককাবাব' নাটকে জীবনধন ও তার সহকর্মীরা জৈবক্ষুধার গ্রাসে মেয়েদের শরীরকে কাবাবের মতোই মনে করেছে। যে ক্ষুধার গ্রাসে তারা কাঁচা মাংসকে নারীর শরীর ভোগের বস্তু মনে করে ভক্ষণ করতে থাকে অপ্রকৃতিস্থ হয়েই। জমিদারদের

ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙে গেছে পান্নালাল তখন সৌদামিনীকে ডেকেও কোনো সারা পেল না। এরপর নাটকের চূড়ান্ত চমক দিলেন নাট্যকার—

"পান্নালাল উঠিয়া গেলেন ও পদ্দা ফাঁক করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন
একী!
জমিদার। কী?
তিনিও উঠিয়া গেলেন ও অন্য পর্দাটা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। দেখা গেল, শূন্যে শেমিজপরা একটি নারীদেহ বরগা হইতে ঝুলিতেছে। পরনের শাড়ি খুলিয়া সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে। জীবনধনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রক্তাক্ত মুখে ভীত বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন
জীবনধন। গলায় দড়ি দিয়েছে—অ্যাঁ, সেকী!"[৮]

সৌদামিনীর এই আত্মহত্যা সমাজের সমগ্র পুরুষ জাতির গালে চপেটাঘাত মেরেছে। যে আত্মহত্যা সে আগেই করতে অসমর্থ হয়েছিল, আজ সে নৃশংস পুরুষের জান্তব থাবা থেকে নিজেকে বাঁচাতে তা করতে সমর্থ হয়েছে। বহুদিনের জমে থাকা সমস্ত অন্তর্বেদনার অবসান ঘটেছে স্বেচ্ছা মৃত্যুতে। যে সমাজ নারীকে আশ্রয় দিতে পারেনি, সেই সমাজের একাংশ শিক কাবাবের মতো ভোগ করতে চেয়েছে নারীকে। রূপকাশ্রয়ের মাধ্যমে নাট্যকার নারীর অন্তঃকরণের অন্তর্বেদনাকে স্বল্পায়তনের এই নাটকে ব্যক্ত করলেন। আর তার সঙ্গে সৌদামিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হল সমাজের এক শ্রেণির ক্ষয়িষ্ণুমানতার দিকটি।

লেহ্য: বেকার সমস্যা ও সমকালীন সমাজের চিত্ররূপ

'লেহ্য' শব্দটির অর্থ লেহন করার যোগ্য। শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল সংস্কৃত √লিহ্+য।[৯] লেহন করে আস্বাদন করা হয় এমন খাবারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় 'লেহ্য' বা 'লেহন' কথাটি। কিন্তু নাট্যকার নামকরণের ক্ষেত্রে কোনো খাবারের স্বাদ আস্বাদনের জন্য এমন নাম ব্যবহার করেননি। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ পদাধিকারীদের পদলেহন করতে হত। সহজ কথায় বলতে গেলে চাটুকারিতাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত। আমরা নাট্যকাহিনি বিশ্লেষণ করলে সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় বিহারের বাঙালিদের করুণ অবস্থার পরিচয় দেখতে পাব। যেখানে শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকরি পেতে বা নেতাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেতে হলে পদলেহন, তৈলমর্দন ইত্যাদি করতে হত। এক হতাশাগ্রস্ত জাতির জীবনের নানান সমস্যার ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে নাটকে। 'বাংলার বাহিরে বাঙালীর শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন:

"যেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা যোগ্যতা নির্ণীত হয় সেখানে কিছু কিছু চাকরি বাঙালীরা পায়, কিম্বা যেখানে যোগ্য বিহারী দুর্লভ সেখানেও পায়, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে বাঙালীর ছেলের চাকরি পাওয়ার আশা নেই, এমন কি নিয়োগকর্তা যদি বাঙালীও হন তবু তিনি যোগ্য বাঙালীকে চাকরি দিতে ভয় পান।"[১০]

'লেহ্য' নাটকেও যোগ্য বাঙালিদের চাকরি না পাওয়ার জন্য বেকার সমস্যা এবং নিয়োগকর্তা ধনেশ্বরবাবুর বাঙালি হয়েও স্বাধীনভাবে বাঙালিদের চাকরি দিতে না পারা—এ দিকগুলি উঠে এসেছে।

নাটকের শুরুতে রঙ্গমঞ্চের ভিতরে দেখা যাচ্ছে 'যুবক সমিতি' নামক বাঙালিদের ক্লাব। ক্লাবের হলঘরে একটি টেবিলকে কেন্দ্র করে কয়েকটি চেয়ারে সদস্যরা বসে আছে। হাইস্কুলে একটি গানের মাস্টার নিয়োগ করা হবে তাই ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে—আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে। চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে এসে হরেন ক্লাবে তাসের আড্ডায় প্রবেশ করল। ইন্টারভিউয়ে হরেনকে ডাকলেও মহাদেবকে ডাকেনি। ছবি'র এই কথায় মহাদেব বলেছে, তার ভগ্নীপতি সব্ ডিভিশনাল অফিসার নয়। শ্যামের জেঠু মুন্সেফ হওয়ায় তার ডাক এসেছিল। হাবু ফার্স্ট ক্লাস এম.এ. গানও জানে চমৎকার কিন্তু তার পরিচিতির অভাবে ইন্টারভিউয়ে ডাক পায়নি। এ নিয়ে আড্ডা যখন তুঙ্গে তখন বীরেন বলল:

"বাঙালিকে আর চাকরি পেতে হচ্ছে না এই বেহারে, তা তিনি ফার্স্ট ক্লাসই হোন আর যাই হোন। তবে ধনেশ্বরবাবুর বাঙালিদের দিকে একটু নেকনজর আছে বলেই যদি বাঙালিকে রাখেন।
ছবি। যা বলেছ।
বীরেন। এবারে দুবে, চোবে, তেওয়ারি, প্রসাদ, সিং, লাল—এদেরই পোয়া বারো। আমি তো আমার ছেলেটার নাম রেখে দিইছি খুবলাল—নাম মাহাত্ম্যে যদি ব্যাটা উতরে যায়।"[১১]

উক্ত কথোপকথন থেকে বিহারের বাঙালি জীবনের বেকার সমস্যার কথা উঠে এসেছে। যে বাঙালি স্বাধীনতার জন্য এত লড়াই করেছে, সেই বাঙালির দুর্দশার চিত্র তুলে ধরলেন নাট্যকার।

স্কুলে গানের নতুন ক্লাস খুলেছে। তাই একজন গায়ক গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ করা হবে। ধনেশ্বরবাবুর গানের ইন্টারভিউ নেওয়া প্রসঙ্গে নিচে নাটক থেকে কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হল:

"জহর। কিন্তু গানের ও কি বোঝে, ও তো ডগ-এক্সপার্ট।

ভবেশ। ওর টাকা আছে, সুতরাং ও সব বোঝে। ওর বাপের টাকাতেই ইস্কুল, ও বুঝবে না তো কি তুমি বুঝবে?

জহর। আরে, ও যে আকাট মুখ্যু।

মহাদেব। আকাট মুখ্যু নইলে অমন বিজ্ঞাপন দেয়!... নান নীড অ্যাপ্লাই হু ইজ নট এ গ্র্যাজুয়েট।"[১২]

টাকা এবং ক্ষমতা থাকলেই পদের অপব্যবহার করা যায়, যোগ্য-অযোগ্য বিচার হয় না। গানের জন্য মাত্র একটি পোস্ট, তার ওপর আবার আড়াইশো জন গ্র্যাজুয়েট দরখাস্ত জমা দিয়েছে। ভবেশ হরেনকে চাকরি পাওয়ার জন্য একটা কৌশল দিয়েছে। ধনেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারি চপলাকান্তবাবুকে যদি তোয়াজ করতে পারে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘুষখোর চপলাকান্তকে ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে না, তাই ওর লেখা গানে যদি সুর দিতে পারে হরেন তাহলে চাকরি নিয়ে তাকে ভাবতে হবে না। 'যুবক সমিতি' ক্লাবে খবর শোনার জন্য রেডিও নেই। এই রেডিওর জন্য ভবেশ নাকি বিহারী কামতাবাবু ও লছমিবাবুর কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছিল। বীরেন তাই বলেছে, "আমরা বেহারীদের গালও দোব, আবার তাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষেও করব। বেশ আছি আমরা।"[১৩] আত্মনির্ভর নয় পরনির্ভর বাঙালির ছবি উঠে এল। এমন হওয়ার একমাত্র কারণ সেকালে বাঙালি যুবক সমাজকে বঞ্চিত করে রাখা। চাকরি না থাকায় বেকার যুবক-যুবতীরা ক্লাবে এসে এক একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তাই দেখা যায় একটা পোস্টের জন্য আড়াইশো দরখাস্ত তার ওপর পদলেহন তো আছেই। 'বেকার সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

> "বেকার-সমস্যাটাই তো আজকালকার দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা।... নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে মানুষ কি তা হলে চেষ্টা করবে না? নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু তার করতে গিয়ে আত্মবিক্রয় করবে না। সে যে মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, এ বোধটা তার সর্বদা জাগ্রত থাকা চাই"।[১৪]

ঘুষ তার ওপর তোয়াজ, খোশামোদ ইত্যাদি করতে পারলে তার চাকরি নির্ভর করত—হরেনের স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তৎকালীন সমাজের এই দিকটি তুলে ধরেছেন। হরেন চপলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দারোয়ান রামবৃক্ষ সিং বাধা দিয়ে বলল চপলাকান্তের সঙ্গে তার দেখা করা হবে না। হরেন উৎকোচ হিসেবে আট আনা দিলে দারোয়ান চপলাকান্তকে খবর দেওয়ার জন্য রাজি হয়। তবে একটা শর্ত দেয়, চাকরি করবার ইচ্ছা থাকলে একটা কাজ করতে হবে:

রামবৃক্ষ। চপ্পাকান্ত বাবুকা পয়ের চাট্‌নে পড়েগা।

হরেন। পা চাটতে হবে?

হরেন। কী করে?

রামবৃক্ষ। জিব্‌ভা নিকালকে। ওই টিবিল দেখছিন...চপ্পাকান্ত্‌বাবু কুরসি পর বৈঠকে টিবিল পর পয়ের চঢ়ায় দিবিন—আর টুল পর বৈঠকে জিব্‌ভা নিকালকে উনকো পয়ের চাটবিন।"[১৫]

এই হচ্ছে পরাধীন ভারতের সমাজবাস্তবতার সকরুণ চিত্র। এরকম করার মানে চপলবাবুদের মতো প্রাইভেট সেক্রেটারিদের খেয়ালখুশি। পদ লেহনকারী ব্যক্তি নাকি এরকম রোজই আসে। হরেনের পরিচিত ফার্স্ট ক্লাস বি.এ. উত্তীর্ণ শ্যামও এসেছিল কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছে। এরপর সেক্রেটারি এসে দেখা দিলেন এবং বললেন, মাইনে ত্রিশ টাকার বেশি দিতে পারবেন না; সে পা চাটতে রাজি আছে কিনা। চাকরি করার জন্য আর একটা কাজ করতে হবে। কুকুরের মুখোশ পড়ে সেক্রেটারির লেখা ধনেশ্বরের পছন্দের গান গাইতে হবে। কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে চপলাকান্তের সঙ্গে হরেনের গাওয়া গান:

"তু তু তু করে ডাকবে যখন,
ল্যাজটি নেড়ে আসব তখন,
লুটিয়ে প'ড়ে চাটব চরণ—
রাতুল চরণ রে।..."[১৬]

হরেনের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর দেখা গেল ক্লাবের সেক্রেটারি অক্ষয়বাবু প্রবেশ করলেন একটা চাকরির সংবাদ নিয়ে। ধনেশ্বরবাবুর সাথে দেখা হলে তিনি বলেন, হরেনের গান ভালো লেগেছে তার। কালই চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট হাতে আসবে।

নাট্যকার বনফুল নাটকের নামকরণের মধ্য দিয়ে সে সময়ের সমাজবাস্তবতার এই পরিচয় তুলে ধরলেন যেখানে উচ্চস্তরের পদাধিকারীদের তুষ্ট করার জন্য তাদের পদলেহন করতে হয়। যেখানে মেধা বিচার হয় চাটুকারিতার ক্ষমতা দেখে। যার চাটুকারিতার ক্ষমতা যত বেশি সে পদের জন্য তত যোগ্য। আসলে হরেন সে সময়ের শিক্ষিত যুবক সমাজের আত্মঅবমাননার প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছে নাটকে। বেকার যুবকদের চাকরি দেওয়ার নামে তৎকালীন সমাজের পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর ঘৃণ্য আচরণের দিকটি তুলে ধরলেন নাট্যকার।

‘জল’: সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ

‘জল’ নাটকে নাট্যকার বনফুল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তৎকালীন সমাজের সামাজিক সমস্যার রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দুটি পরমাণুর মিলনে তৈরি হয় জল। নাটকে এই দুটি পরমাণুর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে তা সমাজে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের সঙ্গে তুলনীয়। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ফলে নারীধর্ষণ, একে অপরের প্রতি হিংসা, নিন্দা, কটূক্তি, পরশ্রীকাতরতা, বোমা, অস্ত্র প্রভৃতি উভয় জনজীবনে কি ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছিল তা রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘হিন্দুমুসলমান’ প্রবন্ধে বলেছিলেন:

> “ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল।”[১৭]

নাটকের শুরুতে নাট্যকার মঞ্চের বর্ণনা দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির দৃশ্য-চিত্র তুলে ধরেছেন। নাট্যকার হাইড্রোজেন-অক্সিজেন দুটি পরমাণুকে আলাদা আলাদা অবস্থায় দেখিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবিটি স্পষ্ট করেছেন। নাটকের শেষে প্রবল দ্বন্দ্বের পর উভয় পরমাণুর মধ্যে কাল্পনিক সম্মিলন দেখানো হয়েছে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রাথমিক অবস্থান নাট্যকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এইভাবে দেখিয়েছেন:

> “কাচপাত্রটির ভিতরে কোটি কোটি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহাদের সকলকে দেখা যাইতেছে না। বৃহদীকৃত অংশটুকুর মধ্যে যখন যাহারা আসিতেছে, তাহাদেরই কেবল দেখা যাইতেছে। নাটকীয় প্রয়োজনে পরমাণুগুলিকে মনষ্যরূপে কল্পনা করা হইল। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিভিন্নতাও তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণ-বিভিন্নতা দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদ শ্বেত এবং অক্সিজেনদের পরিচ্ছদ গৈরিক বর্ণের। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদে হাইড্রোজেনের প্রোটন-ইলেকট্রনসমন্বিত রাসায়নিক রূপটি লাল সুতা দিয়া অঙ্কিত থাকিবে; তাহাদের পতাকাও এই চিহ্ন বহন করিবে। অক্সিজেনদেরও তদ্রূপ।”[১৮]

প্রথমে কয়েকজন হাইড্রোজেন তর্ক করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করল। ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যেও দ্বান্দ্বিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাদের ধর্ম আজ বিপন্ন তাই ধর্মের জন্য তারা মিটিং করতে চাই। ১ম্ হাইড্রোজেন জানায়, ধর্মের বিপন্নতার জন্য তারা আজ বিপন্ন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এমন সময় ৮ম্ হাইড্রোজেন সভার মধ্যে এসে জানাল, কয়েকজন অক্সিজেন গুণ্ডা তার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। আবার রাজনৈতিক নেতাদের কথাও এসেছে যারা ধর্মকে ইস্যু করে ভোটে জিতে মুনাফা অর্জন করে। ৮ম্ হাইড্রোজেন যিনি সাধারণ মানুষের ভোটের জোরে লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আজ অক্সিজেনদের চাকরি দিচ্ছেন, কেননা তাদের হাতে রেখে তিনি সামনের ইলেকশনে জিততে চেয়েছেন।

এবার মঞ্চে অক্সিজেনদের আবির্ভাব হয়েছে, সভাপতির সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। যার যা বক্তব্য আছে তা রাখার উপদেশ দিলেন তিনি। ১ম্ অক্সিজেন বেশকিছু সমস্যার কথা ব্যক্ত করল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাগুলোর অবস্থা ভীষণ খারাপ, এর কারণ কন্ট্রাক্টরদের কাজে ফাঁকি। বোর্ডের শতকরা আশি জন কন্ট্রাক্টর এবং পঁচাত্তর জন ওভারশিয়ার হাইড্রোজেন জাতীয়। ডিস্ট্রিক্ট এবং লোক্যাল উভয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হাইড্রোজেন তাই অক্সিজেনদের দুরবস্থা। ৩য় অক্সিজেন বক্তব্য দিতে গিয়ে জানাল, বর্তমানে ‘হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের বিরোধ’টা অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করেছে আর এ নিয়ে খবরের কাগজে গুজবের রং ছড়িয়ে বিষয়টিকে জটিল করে তোলা হচ্ছে। সে অক্সিজেন-হাইড্রোজেন উভয় জাতিকৃত গত বছরের ‘নারী-ধর্ষণের’ একটি পরিসংখ্যান তথ্য হিসেবে তুলে ধরেছে:

> “অক্সিজেন কর্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ
> বিধবা—১২ জন
> সধবা—১৪ জন
> কুমারী—১৮ জন = মোট ৪৪ জন
> অক্সিজেন কর্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ
> বিধবা—৭ জন
> সধবা—১৩ জন
> কুমারী—৬ জন = মোট ২৬ জন
> হাইড্রোজেন কর্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ
> বিধবা—৩৫ জন

সধবা—২০ জন
কুমারী—১৩ জন = মোট ৬৮ জন
হাইড্রোজেন কর্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ
বিধবা—২২ জন
সধবা—২১ জন
কুমারী—৫ জন = মোট ৪৮ জন

স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, হাইড্রোজেনরাই অধিকসংখ্যক নারী ধর্ষণ করেছেন, যদিও অক্সিজেনরাও এ বিষয়ে একেবারে নিরপরাধ নন। আমি নিজে অক্সিজেন-জাতীয় হ'লেও সকলের জন্যই লজ্জাবোধ করছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি হাইড্রোজেন-জাতীয়দের এই অধিক অপরাধ-প্রবণতার দিকে কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টিও আকর্ষণ না করে পারছি না।"[১৯]

এরপর সভাপতি অক্সিজেন জাতিদের অতীত গৌরবের দিনগুলির কথা স্মরণ করাতে চেয়েছেন, যাতে তারা হীন কাজ করতে অগ্রসর না হয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করে তিনি অক্সিজেনের অস্তিত্ব আবিষ্কার, তাদের চরিত্রের ধর্ম এবং বৈশিষ্ট সম্পর্কে একটি লম্বা বক্তৃতা দিয়েছেন। এমন সময় হাইড্রোজেন জাতির এক ব্যক্তি সভামধ্যে প্রবেশ করে তাদের গৌরবের ইতিহাস স্মরণ করিয়েছে। বক্তব্যের মাঝে অক্সিজেনদের একজন তার গায়ে জুতো ছুঁড়েছে। এরপর সভায় উভয় জাতির মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়, যা শেষপর্যন্ত যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। এরপর চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় এবং—

আলো জ্বলিলে দেখা গেল, হাইড্রোজেন অক্সিজেন কেহ নাই, একটি টেবিলের উপর অবস্থিত ফ্লাস্কে নির্মল জল টলমল করিতেছে। তড়িৎশিখার যাদুস্পর্শে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পরমাণুগুলির লম্ফ-ঝম্প জল হইয়া গিয়াছে।"[২০]

নাট্যকার বনফুল অতি সুকৌশলে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উভয় পরমাণুরূপী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলনের চিত্রটি প্রদর্শন করলেন। শিল্পীরা তো যুগে যুগে মিলনের জয়গানই গায়তে আসেন। শিল্পী বনফুলও হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের রূপকে উভয় জাতির মিলনের দিকটি আপন তুলিকায় অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, নাট্যকার বনফুল সমাজের একজন হয়েই সমাজমনস্কতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সামাজিক সমস্যার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাকে নাটকের মাধ্যমে শিল্পরূপ দিয়েছেন। 'শিককাবাব'-এ উঠে এল সমাজের সেই ব্যাধিচিত্র, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচারের চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'লেহ্য'য় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকারের জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ব্যক্ত হল। যা আজকের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকার জীবনেরই চালচিত্র স্বরূপ। 'জল'-এ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর রূপকে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কথার চিত্রণই প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। তাই বলা যায়, বনফুলের এই একাঙ্ক নাটকগুলি সে যুগের সমাজবাস্তবতার বহুমাত্রিক রূপ হয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেওয়ার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর। 'নাট্যতত্ত্ব বিচার'। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ভাদ্র ১৪০১, কলকাতা, পৃ. ২৫০।
২. ঘোষ, অজিতকুমার। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর ১৯৬০, কলকাতা, পৃ. ৫৯৪।
৩. বনফুল। 'শিককাবাব', বনফুলের নাটকসমগ্র (খণ্ড ২)। বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১১।
৪. তদেব, পৃ. ১১১।
৫. তদেব, পৃ. ১১২।
৬. তদেব, পৃ. ১১৪।
৭. তদেব, পৃ. ১২২।
৮. তদেব, পৃ. ১২৩।
৯. চৌধুরী, জামিল (সম্পা.)। 'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান'। বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ১২১০।

১০. বনফুল। ‘বাংলার বাহিরে বাঙালীর শিক্ষা সমস্যা’, বনফুল রচনাবলী (খণ্ড ১৫)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৬০।
১১. বনফুল। ‘লেহ্য’, বনফুলের নাটকসমগ্র (খণ্ড ২)। বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২৫।
১২. তদেব, পৃ. ১২৭।
১৩. তদেব, পৃ. ১৩০।
১৪. বনফুল। ‘বেকার সমস্যা’, বনফুল রচনাবলী (খণ্ড ১২)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪০৫-৪০৬।
১৫. বনফুল, ‘লেহ্য’, বনফুলের নাটকসমগ্র (খণ্ড ২)। বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৩৩।
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৫।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘কালান্তর’। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৩১৭।
১৮. বনফুল, ‘জল’, বনফুলের নাটকসমগ্র (খণ্ড ২)। বাণীশিল্প, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১৩৯।
১৯. তদেব, পৃ. ১৪৫-১৪৬।
২০. তদেব, পৃ. ১৪৮।